মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ৫ম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, আগস্ট ২০২৪

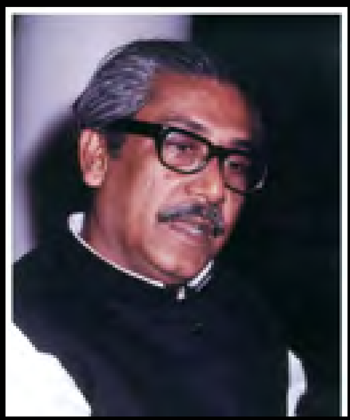

১৫ আগস্ট

স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নির্মাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে অগণিত মানুষের বিপুল আত্মত্যাগের বিনিময়ে পৃথিবীর বুকে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের। দ্বিজাতি-তত্ত্ব দ্বারা পরিচালিত পাকিস্তান রাষ্ট্র বাঙালি জাতিসত্তা পদদলিত করে যে শোষণ-পীড়ন চাপিয়ে দিয়েছিল তার বিপরীতে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করে অভূতপূর্ব সংগ্রাম পরিচালনা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের আপামর জনসাধারণ একটি জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিজয় অর্জন করে। তিনি ইতিহাসের মহানায়ক, নিপীড়িত জাতির মুক্তি-আন্দোলনের রূপকার। স্বাধীন দেশে মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে ঘাতক-চক্র পরিবারের সদস্যবর্গসহ তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাঁর কীর্তি স্মরণ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নিবেদন করে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চ-এর ভাষণ ইউনেস্কোর মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ড-এর আন্তর্জাতিক রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত হয় ২০১৭ সালে। ইতিহাসের পাঠ গ্রহণের অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের ইউনেস্কো-কৃত মূল্যায়ন উদ্ধৃত হলো:

The Historic 7th March Speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

"The Historic 7th March Speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman" was delivered by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman on 7th March, 1971 who led the people of Bangladesh to independence in 1971. At that time when the Pakistani military rulers refused to transfer power to the Bengali nationalist leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, whose party Awami League gained majority in the National Assembly of Pakistan in the general election held in 1970. The speech effectively declared the independence of Bangladesh. The speech constitutes a faithful documentation of how the failure of post-colonial nation-states to develop inclusive, democratic society alienates their population belonging to different ethnic, cultural, linguistic or religious groups. The speech was extempore and there was no written script. However, the speech survived in the audio as well as AV versions.

জাপানি আলোকচিত্রী তাইজো ইচিনোসে'র আলোকচিত্র নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে বিশেষ প্রদর্শনী

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে সংবাদ সংস্থা ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনাল (ইউপিআই)এর অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় আসেন তাইজো ইচিনোসে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা তখন ধ্বংসস্তূপ। মূলত বিহারি ক্যাম্পের ছবি তোলার দায়িত্ব নিয়ে ইউপিআই এর প্রতিনিধি হয়ে ঢাকা এসেছিলেন তাইজো। তবে শুধু বিহারি ক্যাম্পের ছবি তুলেই ক্ষান্ত হননি তিনি, তাঁর ক্যামেরায় উঠে এসেছে সদ্য স্বাধীন দেশে বাঙালির শোক, সংগ্রাম, বিজয়ের উচ্ছাস, ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয় এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ধ্বংস্বযজ্ঞ।

বাংলাদেশে দেড় মাসের অবস্থানে তাইজো ইচিনোসে দুশোটির মতো ছবি তুলেছিলেন, সেখান থেকে নির্বাচিত ৫৩টি আলোকচিত্র নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে চলছে 'Newly Emerged Bangladesh through the Lens of a Japanese Photographer' শীর্ষক বিশেষ আলোকচিত্র প্রদর্শনী। প্রদর্শনীটি গত ২০ জুলাই শুরু হয়েছে যা চলবে আগামী ২০ আগস্ট পর্যন্ত।

১৯৪৭ সালে জাপানের সাগা প্রিফেকচারে জন্ম নেয়া তাইজো ইচিনোসে ১৯৭৩ সালের নভেম্বরে নিখোঁজ হন। ১৯৮২ সালে প্রিয়াহাডাক নামে একটি ছোট গ্রামের গ্লাস ফিল্ডে তাইজো ইচিনোসে-এর মৃতদেহ খুঁজে পায় তাঁর পরিবার।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত বিশেষ এই আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে সহযোগিতা প্রদান করেছে 'দ্যা ফটোগ্রাফিক সোসাইটি অব জাপান' এবং 'তাইজো ইচিনোসে-এর পরিবার'। প্রদর্শনীটি কিউরেশনের দায়িত্বে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আর্কাইভ অ্যান্ড ডিসপ্লে বিভাগের কিউরেটর আমেনা খাতুন। সহযোগীতায় ছিলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কিউরেশন টিম।

-আর্কাইভ অ্যান্ড ডিসপ্লে

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিভাষ্য : ড. নুরুন নবী

আমার জন্ম হয়েছে টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর থানার কামারপাড়া গ্রামে। আমার শৈশব কেটেছিল গ্রামীণ সবুজ-শ্যামল আনন্দঘন পরিবেশে। আমার স্কুল ছিল সানকবয়রা প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং হেমনগর শশীমুখী উচ্চ বিদ্যালয়। আমি রাজনৈতিকভাবে সচেতন হই আমার বাবর কারণে। তিনি ছিলেন টাঙ্গাইলের কৃষক নেতা হাতেম আলী খানের শিষ্য। এভাবে আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যটা বুঝতে শুরু করলাম। আমি চিন্তা করতে থাকলাম এর থেকে উত্তরণের উপায় কি। সেই সময় ১৯৬৬ সালের মাঝামাঝি, শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফার প্রচরনা করতে ময়মনসিংহ আসলেন। আমি তখন আনন্দ মোহন কলেজের ছাত্র। সেই জনসভায় আমি উপস্থিত হলাম। সেই প্রথম আমি শেখ মুজিবকে দেখলাম। তখনও তিনি বঙ্গবন্ধু হননি। ব্যাকব্রাশ করা চুল। কালো চশমা। সাদা পায়জামা-পঞ্জাবি। এমন বাঙালি সুপুরুষ সেই সময় অব্দি আমি দেখিনি। তিনি বজ্রকণ্ঠে সেখানে ভাষণ দিলেন। তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য তুলে ধরেন এবং এর থেকে উত্তরণের পথ দেখালেন। তিনি আইয়ুব খানের উদ্দেশে বলনে, 'আপনার সাথে আমার ব্যক্তিগত বিরোধ নেই। আমি শুধু পূর্বপাকিস্তানের মানুষের অধিকারের কথা বলছি।' সেই জনসভা শেষে ঢাকা ফেরার পথে রেলস্টেশনেই তাঁকে গেফতার করা হলো। এইভাবে সেসময় তিন মাসে তিনি প্রায় তেরোবার গ্রেফতার হয়েছিলেন। তিনি এক শহরে আটক হন, কোর্ট তাঁকে জামিন দেন। তিনি জনসভা করেন, আবার আরেক শহরে তাঁর নামে মামলা হয়। তিনি আবারও এরেস্ট হতে থাকেন। আমরা ছাত্ররা সচেতন ছিলাম যে, শেখ মুজিবকে এক ধরনের হয়রানি করা হচ্ছে। সেই সময়ে ময়মনসিংহের জনসভায় তাঁর বজ্রকণ্ঠের ভাষণ শুনে আমি শেখ মুজিবকে আমার নেতা হিসেবে মনোনিত করলাম। আমি বুঝলাম আমি যে সমস্যার সমাধানের কথা ভাবি, যে সমস্যার কথা পত্রপত্রিকায় দেখি, ওনার মতো নেতাই সেই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। এভাবেই ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে, সেসময়ের লাখো তরুণের মতো আমি আমার নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে নিজের রাজনৈতিক নেতা হিসেবে নির্বাচিত করি। এরপর ১৯৬৭ সালে ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন কলেজে আমার লেখাপড়ার পার্ট চুকিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োক্যামিস্ট্রি বিভাগে ভর্তি হলাম। ফজলুল হক হলে আমার স্থায়ী নিবাস হলো তখন। ঢাকায় এসেই কিন্তু আমি সক্রিয়ভাবে ছাত্র রাজনীতিতে অংশগ্রহণ শুরু করি। তারপর ছয়-দফা, এগারো-দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন, একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের মতো প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে যুক্ত থাকি। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ১ তারিখ আমাদের অনার্স পরীক্ষার মাত্র দুই ঘন্টা বাকি ছিল। হঠাৎ রাস্তা থেকে মিছিলের শব্দ ভেসে এলো। ইয়াহিয়া খান ৩ তারিখের গণপরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেছে। কিসের পরীক্ষা কিসের কি সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা রাস্তায় নেমে আসলো। এরপর বঙ্গবন্ধু যখন অসহযোগের ডাক দিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় তখন বন্ধ হয়ে গলো। আমাদের হলের সাত-আট শত ছাত্র সবাই বাড়ি চলে গেলো। আমরা ছাত্রলীগের দশ-বারো জন এবং ছাত্র ইউনিয়নের দুই-তিন জন রয়ে গেলাম অসহযোগের সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে। এসময় আমাদের কাজ ছিল, বিভিন্ন জায়গায় মিটিং-এ শ্লোগান দেওয়া, পোস্টার লাগানো এবং মানুষজনকে ফোন দিয়ে খবর দেয়া। ৭ মার্চ গুজব উঠেছিল ধানমন্ডির বাসা থেকে রেসকোর্সে আসার পথে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানি কমান্ডোরা গুলি করে মেরে ফেলবে। এজন্য সমগ্র রাস্তা জুড়ে কর্মীরা নিরাপত্তা বলয় তৈরি করলো। আমরা অবস্থান নিয়েছিলাম সাইন্সল্যাব মোড়ে। বঙ্গবন্ধু তো আর আসে না। পরে শুনলাম বঙ্গবন্ধু অন্য রাস্তা দিয়ে রেসকোর্সে পৌঁছে গিয়েছেন। এটা গোপন রাখা হয়েছিল নিরাপত্তার স্বার্থে। যাই হোক, আমরা তড়িঘড়ি করে রেসকোর্স গেলাম। আমাদের ইচ্ছা ছিল মঞ্চের একদম পাশে বসে বক্তৃতা শোনার কিন্তু, গিয়ে দেখি তিল ধরার জায়গা নেই মাঠে। অবশেষে হাইকোর্টের কাছে যেখানে শেষ মাইকটি ছিল, আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনলাম। আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেলো এটাই স্বাধীনতার ঘোষণা। পরে অসহযোগ আন্দোলন চললো। ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এলো আলোচনা করতে। আলোচনার নামে তারা সামরিক প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো। আমরা ছাত্রলীগের একটি অংশ যুদ্ধের জন্য ট্রেনিং নিয়েছিলাম। তখন কামাল সিদ্দিকী নামে ঢাকার বাইরের একজন এসডিও আমাদের সাথে দেখা করতে চাইলেন। আমি, আমিন, হাবিবুল্লাহ, রশিদুল আলম, জুলফিকার, সৈয়দ আশরাফ, ড. আনোয়ার হোসেন আমরা এই কয়েক জন মালিবাগের এক বাড়িতে কামাল সিদ্দিকীর সাথে দেখা করলাম। সেখানে একজন প্রাক্তন নকশালিস্ট নেতা আমাদের বোমা বানানোর ট্রেনিং দিতেন। এরপর, ছাত্র সমাজের চার খলিফার একজন আব্দুল কুদ্দুস মাখন ভাই আমাদের এফএইচ হলের ছাত্র, তিনি ২৫ মার্চ দুপুরে আমিনুল হক, হাবিবুল্লাহ এবং আমাকে ডেকে বললেন, বঙ্গবন্ধু ও ইয়াহিয়ার আলোচনা ভেস্তে গেছে। আজকে রাতে ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান চলে যেতে পারে এবং রাতে ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়েল ওপর সেনাবাহিনী আক্রমণ করতে পারে তোমরা ইকবাল হলের (সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অফিসে গিয়ে জেনে নেবে তোমাদের করনীয়। আমরা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অফিসে গেলাম। হেলালুর করিম চিশতি নামে (বগুড়ার ছেলে) একজন ছাত্রলীগের কর্মী সেখানে বসতো। শ্লোগানের জন্য খুব বিখ্যাত ছিল, আমদের খুব ঘনিষ্ট বন্ধু। প্রতিদিন ওখানে শত শত লোকসমাগম হতো। কিন্তু সেদিন গিয়ে দেখি চিশতি কয়েকজন লোক নিয়ে বসে আছে, আর কেউ নাই। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। চিশতি আমাদেরকে বললো, শাহবাগ হোটেলের সামনে ব্যারিকেড দিতে, এখন যেখানে বইয়ের দোকান। যাতে পাকিস্তান আর্মি সহজে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতে প্রবেশ করতে না পারে। এখন যেখানে জাতীয় জাদুঘর, তখন সেখানে ডোবা ছিল, নিচু জায়গা একটা বস্তি ছিল হাজার হাজার মানুষ থাকতো সেখানে। চিশতি আমাদেরকে বললো সেই বস্তি থেকে মানুষ নিয়ে ব্যারিকেডটা দিতে। কারণ তখন ছাত্র ছিলাম আমরা কয়েকজন মাত্র। আমরা বস্তির একজন শ্রমিক নেতার সহায়তায় ৫০/৬০ জন লোক নিয়ে ব্যারিকেড দিতে শুরু করলাম। রাত সাড়ে এগারো কি পোনে বারোটার দিকে আমার যখন কাজ করছিলাম তখন আমি একটু দম নেয়ার জন্য ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখন দেখলাম পাঁচ-ছয়টা আর্মি জিপ বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে আসছে। শাহবাগে তখন একটা পানির ফোয়ারা ছিল, সেটার সামনে এসে থামলো। গাড়ির লাইট জ্বালিয়ে দেখলো আমরা কি করছি। তারপর পেছনের জিপগুলো পাশাপাশি অবস্থান নিলো। তারপর আমাদের দিকে মেশিনগানের গুলিবর্ষণ শুরু করলো। জীবনে প্রথম এতো কাছ থেকে মেশিনগানের গুলির শব্দ শুনলাম। আমি যেহেতু ফুটপাথ দাঁড়িয়ে ছিলাম, তাই আমার গায়ে গুলি লাগে নাই। কিন্তু গুলির শব্দে ভয়ে পাশের ডোবায় লাফ দিয়ে প্রাণ রক্ষা করি। ওখান থেকে সম্বিত ফিরে পাওয়ার পর মনে হলো আমার গায়ে বোধহয় গুলি লেগেছে। আসলে লাগেনি। কাদার মধ্য থেকে উঠে দৌড়ে এলিফেন্ট রোডের রেলক্রসিং (কাটাবন মোড়) পার হই। ভয় এবং নার্ভাসে আমি দৌড়াচ্ছি কিন্তু আমার পা আর ওঠে না। মনে হচ্ছে গুলি খেয়েছি। রেলক্রসিং পার হয়ে আমার কাজিনের বাসা ছিল, ওখানে গিয়ে আশ্রয় নেই। সেখানে গিয়ে বুঝতে পারি আমার গায়ে গুলি লাগেনি, কিন্তু ডোবায় লাফ দিয়ে পড়ায় গায়ে ইটপাটকেলর খোঁচায় আহত হয়েছি। পরে পরিস্কার করে একটু দম নিতেই দেখি চারদিকে গোলাগুলি শুরু হয়ে গেলো। গোলাগুলির শব্দ, আগুনের লেলিহান এবং ধোঁয়া কুণ্ডলি দেখে মনে হচ্ছিল ঢাকা শহরটা নরকে পরিণত হয়েছে। পাকিস্তান আর্মির এই গ্রুপটাই জগন্নাথ হল ও ইকবাল হলে আক্রমণে অংশ নিয়েছিল। রাজারবাগ, পিলখানা, পুরান ঢাকাসহ ঢাকা শহরের নানা জায়গায় গণহত্যা চললো সারারাত। সকালবেলা ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণে বললো– পূর্বপাকিস্তানে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে এবং শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শেখ মুজিব দেশদ্রোহী। এইসব। কার্ফু উঠে যাওয়ার পর আমি কাজীর সাথে বুড়িগঙ্গা পাড়ি দিয়ে ওনার ব্যবসায়িক পার্টনার খাজা ভাইয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। আমরা যেই গ্রামে আশ্রয় নিলাম তার পাশের গ্রামে যখন আক্রমণ শুরু হলো আমরা তখন ঢাকা ফিরে আসলাম আবারও। আমাদের বন্ধুরা ২৫ মার্চের পর কে কোথায় ছিটকে গেলো আমি তার কোন খবর পেলাম না। পরে জেনেছি একেক জন একেক জাগায় যুদ্ধ করেছিল। আমি ঢাকা থেকে আমার নিজ গ্রাম টাঙ্গাইলের কামারপাড়ায় চলে এলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল পরিবারের সবার সাথে দেখা করে ভারতে যাওয়া। আমার সাথে ছিল আমার এক দুলাভাই যিনি ইপিআর-এ চাকরি করতেন এবং আমার বন্ধু লতিফ। কিন্তু প্রথম দফায় ঢুকতে পারলাম না। সীমান্তবর্তী যে বাড়িতে আমরা আশ্রয় নিয়ে ছিলাম, সেখানে জামালপুর থেকে আগত কলেজ পড়ুয়া একটা মেয়ে চিরকুট পাঠিয়ে জানালো আগামীকাল এখানে শান্তি কমিটির লোকজন পাকসেনাদের সাথে নিয়ে সীমান্ত এলাকায় রেইড দিবে। তাই আমরা যেনো এখান থেকে চলে যাই। এই বার্তা পেয়ে আমরা জামালপুরের চরাঞ্চল দিয়ে ৫০/৬০ মাইল হেঁটে আবার বাড়ি ফিরলাম। পরে টাঙ্গাইলে ছাত্র নেতা আরজু, সরোয়ার্দি এবং আমি মিলে একটি মুক্তিবাহিনী গঠন করলাম। ওরা আমাকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করলো। আমরা টাঙ্গাইলে মুক্তিবাহিনীকে সংগঠিত করতে লাগলাম। এরপর একদিন আটজন ছেলে গরমের মধ্যে চাদর গায়ে দিয়ে আমাদের বাড়িতে এলো। ওদের চাদরের নিচে স্টেনগান। জানালো ওরা ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছে। আমাদের মুক্তিবাহিনীর খবর পেয়ে এখানে এসেছে। যমুনার পাড়ে একটি গ্রামে আমাদের ক্যাম্পে ওদের নিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি আমার বাকি দুই সহযোগি ভুয়াপুরে কাদের সিদ্দিকীর সাথে দেখা করতে গেছে। কাদের সিদ্দিকীকে আমি আগে থেকে চিনতাম। পরে এই আটজনকে নিয়ে কাদেরিয়া বাহিনীর সাথে জয়েন করলাম আমরা। (চলবে)

সাক্ষাৎকার: শরীফ রেজা মাহমুদ

ভুলি নাই শহিদের কোন স্মৃতি/ ভুলব না কিছুই আমরা

ভূপতিনাথ চক্রবর্তী চৌধুরী

ভূপতিনাথ চক্রবর্তী চৌধুরী ছিলেন কিশোরগঞ্জ জেলার গাঙ্গাটিয়া এলাকার জমিদার। তিনি ছিলেন সঙ্গীত ও চিত্রকলার সমঝদার ব্যক্তি। চল্লিশের দশকে কলকাতা আর্ট কলেজ থেকে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে শিক্ষা সমাপন করেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য হিসেবে বেঙ্গল স্কুল ধারায় ছবি আঁকায় তিনি দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। ১৯৭১ সালের ৭ মে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী স্থানীয় রাজাকারদের সহযোগিতায় গাঙ্গাটিয়া গ্রাম আক্রমণ করে। ক্যাপ্টেন বোখারির নেতৃত্বে এই হামলা পরিচালিত হয়। তারা ভূপতিনাথ চক্রবর্তী চৌধুরী ও আরো কয়েকজনকে আটক করে। শোনা যায়, জেরার এক পর্যায়ে ক্যাপ্টেন বোখারি তাঁর বাদন ও গান শুনতে চান। গান পরিবেশনের পর ভূপতিনাথ চক্রবর্তী চৌধুরী ও অন্যদের বাড়ির শিবমন্দিরের সামনে এনে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়।

ভূপতিনাথ চক্রবর্তীর আঁকা চিত্রকর্ম

শহিদ শামসুল করিম খান

শামসুল করিম খান ছিলেন বিমান বাহিনীর সদস্য। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তাঁকে পাবনার পাকশী এলাকায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। তিনি তখন পাকিস্তান বিমান বাহিনী ত্যাগ করেন এবং সেখানকার গ্রামবাসীদের প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। এই খবর পেয়ে এপ্রিল মাসে তাঁকে ধরে নিয়ে পাকবাহিনী অমানুষিক অত্যাচারের পর নির্মমভাবে হত্যা করে। শামসুল করিম খানের কোরআন শরীফ।

দাতা : মিসেস নীলুফার

বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার কমরউদ্দিন চৌধুরী

কমরউদ্দিন চৌধুরীর জন্ম সিলেটের কানাইঘাটে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে ৪নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন। তিনি ২৯ আগস্ট ১৯৭১ ভারতের সোনাকিয়া ইয়ুথ ক্যাম্পে সিকিউরিটি কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত হন। পরে তিনি ভারতের লোহার বন্ধ লেভেল সেক্টরের এবং বারপুঞ্জি সি কোম্পানির কমান্ডার নিযুক্ত হন। পরবর্তী সময়ে তিনি এফএফ (ফ্রিডম ফাইটার) ক্যাপ্টেন হিসেবে কোয়ার্টার মাস্টারের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সফল নেতৃত্বে ৪-১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ সিলেটের কানাইঘাট থানা স্বাধীন হয় এবং তিনি এই থানার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন।

দাতা: কমর উদ্দিন চৌধুরী

স্মারক কথা বলে >>>

জীবন থেকে নেয়া চলচ্চিত্রের বুকলেট

১৯৭০ সালে কালজয়ী চলচ্চিত্র পরিচালক জহির রায়হান 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন। সামাজিক প্রেক্ষাপটে নির্মিত এই চলচ্চিত্রে বাঙালির স্বাধীকার আন্দোলনকে রূপকের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। সেসময় 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রটি বাঙালি জাতির মনে প্রবলভাবে রেখাপাত করে। সেই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের তত্ত্বাবধানে চলচ্চিত্রটি ভারতের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে বাণিজ্যিকভাবে প্রদর্শিত হয়। যা থেকে অর্জিত অর্থ মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে ব্যয় করা হয় । কলকাতায় এমন একটি প্রদর্শনীতে বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় উপস্থিত ছিলেন।

'জীবন থেকে নেয়া চলচ্চিত্র'-এর দুর্লভ বুকলেটটি 'সত্যজিৎ' পত্রিকার সম্পাদকের সংগ্রহে ছিল। এই বুকলেটটি মুক্তিযুদ্ধের অমূল্য স্মারক হিসেবে ২০১৯ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সংগ্রহ করে।

দাতা : সোমনাথ রায়

মুক্তিপণের একশত টাকা

জামালপুরের বকশীগঞ্জের গোপাল পাল-এর একমাত্র পুত্র মহাদেব পালকে ওসি নূরুল আমিন তুলে নিয়ে যায় এবং মুক্তিপণ হিসেবে টাকা দাবি করে। পুত্রকে ছাড়িয়ে আনতে গোপাল পাল একশত টাকা নিয়ে যাওয়ার সময় পথে জানতে পারেন তাঁর ছেলেকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। পুত্র হারিয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত গোপাল পাল একশত টাকার এই নোটটি আমৃত্যু নিজের কাছে আগলে রেখেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর স্মারকটি ২০২২ সালে তাঁর পরিবারের নিকট হতে সংগ্রহ করে।

দাতা: রতন সরকার ও মনোতোষ চন্দ্র সরকার

নারী-নির্যাতনের সাক্ষী পাকিস্তানি দুই আনা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আহ্বানে প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য-সংগ্রহ করেছিল জামালপুরের স্কুল-বালক। একাত্তরে তার পিতা ছিলেন একান্তই কিশোর, তখন দুধ নিয়ে বাজারে যাওয়ার সময় আর্মি-ক্যাম্পের প্রহরী তাঁকে ডেকে নেয় ভেতরে, পাত্রের দুধ ঢেলে রেখে বিনিময়ে এই পয়সা কিশোরকে দেয়। ক্যাম্পে কিশোর দেখেছিল অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা বিবসনা তিনজন নারীকে, বাংলার এই তিন কন্যার সারা শরীরে ক্ষতের চিহ্ন। সেই স্মৃতি বালক জীবনে আর ভুলতে পারেনি, সেই পয়সাও আর কখনো খরচ করেনি। শিক্ষার্থী পুত্র মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে জমা দিয়েছে পিতার বয়ান এবং এই দুই আনা। পাকিস্তানি এই মুদ্রা নারী-নির্যাতনের অনেক ঘটনার সাক্ষী, কীভাবে সেই সাক্ষ্য শুনতে পারা যাবে তা আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ।

দাতা : মো: জিল্লুর রহমান জামিল

শিক্ষার্থীদের পাঠানো প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্য

লাল না সাদা

খীরু এবং মাটিকাটা নদীর সংযোগস্থলে একটি বাজার, নাম পারুলদিয়া। এর পূর্বে অবস্থিত আর একটি বাজার ত্রিমোহনী।

১৯৭১ সালের ১৬ অক্টোবর। অন্য দিনের মত সেদিনও লোকজন তাদের কাজ কর্ম নিয়ে ব্যস্ত ছিল। তখন দুপুর ১২টা, কাওরাইদ রেল লাইনের ওপর দিয়ে ৪-৫টি হেলিকপ্টার এসে ত্রিমোহনী ও পারুলদিয়া বাজারের উপর বোমা নিক্ষেপ করে। ধ্বংস হয়ে যায় প্রায় সব কিছু। প্রায় সবাই মারা যায় ওখানকার। অল্প সংখ্যক লোক তাদের জীবন বাঁচাতে সক্ষম হয়। সেদিনের মত পাকিস্তানিরা চলে যায়। ঠিক তার দু-দিন পরে তারা সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করে ওই দুই বাজারসহ আশপাশের অনেক অঞ্চলে। লোকজন বুঝতেও পারল না কী হচ্ছে। চতুর্দিকে বৃষ্টির মতো গুলি ছুঁড়তে লাগল পাকবাহিনী। গ্রামগুলো এই অতর্কিত হামলায় প্রায় জনশূন্য হয়ে যায়। মৃত দেহগুলোকে শক্ত তার দিয়ে ৮-১০টা একত্রে গেঁথে দুই নদীর সংযোগস্থলে ভাসিয়ে দিল।

কিছু লাশ আসত খীরু আর কিছু লাশ আসত মাটিকাটা নদীতে। বড়ো বড়ো মাছ এই সব লাশ খেতো। প্রতিদিন প্রয় ৭০-৮০টি লাশ এভাবে আসত। এভাবে পাঁচ দিন পর্যন্ত শুধু লাশ আসতে থাকে। তখন বলা কঠিন ছিল নদীর পানি লাল না সাদা। এভাবে ১০ দিন হল। গোপনে একদল মুক্তিযোদ্ধা এলো অসহায় লোকদের সাহায্য করতে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই কথা প্রকাশ হয়ে যায় বর্বর পাকবাহিনীর কাছে। পাকিস্তানিরা পুনরায় হামলা চালায়। মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দানের কারণে ৬৫ জনকে গ্রেফতার করে। তবে যোদ্ধারা কেউ ধরা পড়েনি। তারা পালাতে সক্ষম হয়। সেই ৬৫ জনকে তারা নাদীর ধারে গুলি করে মারে এবং আগের মতোই তার দিয়ে লাশগুলোকে বেঁধে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। পরে তারা সবগুলো গ্রামের প্রতিটি ঘর তল্লাশি করে। যাদেরকে সন্দেহ করেছে তাদেরকেই ধরে মেরে ফেলেছে।

এক জায়গায় তল্লাশি করতে করতে একজনকে মেরে ফেলে। তার ছিল ৭ মাস বয়সের ছোট্ট একটি পুত্র সন্তান। এই ছোট্ট বালকটিকেও তারা রেহাই দেয়নি। তার দুটি পা ধরে হেঁচকা টান মেরে দুইভাগ করে ফেলে।

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. মেহেদী হাসান জুয়েল কাপাসিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ৮ম, রোল : ১৩	**মো. আলী আমজাদ** গ্রাম : গলদাপাড়া, হয়দেবপুর শ্রীপুর, গাজীপুর

বাবার হত্যালীলা প্রত্যক্ষ করতে হল

সেদিন ছিল ১৯৭১ সালের জুন মাসের সম্ভবত ১৭ তারিখ। বেলা ১১টার সময় সিংহঝুলী গ্রামে ঘটে যায় এক ভয়ানক ঘটনা। গ্রামের সবাই সেদিন ছিল কর্মমুখর, প্রতিদিনের মতোই সেদিনও সবাই যার যার কাজে আপন কর্মক্ষেত্রে চলে যায়। গ্রামের সবার মাঝেই কিন্তু যুদ্ধের আতঙ্ক বিরাজ করছিল। ঘটনার শিকার বাদল মিয়ার বাবাও নিজ কর্মক্ষেত্রে ছিলেন। বাদল তার বাবার জন্য সকালের খাবার নিয়ে যায় মাঠে। খাবার শেষে তার বাবা আর মাঠে রইল না শরীর খারাপ থাকায়। তাই বাদল ও তার বাবা মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছিল। তখনই হঠাৎ যেন কী রকম পোড়া গন্ধ পেতে থাকে তারা। তারা ভাবে হয়তো কিছু পোড়া হবে। কিন্তু না, আসলে ওটা ছিল পাকিস্তানি হায়েনাদের সৃষ্টি। বাদলের বাবার শরীরের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। ফলে তার বাবা বাদলকে গাছ থেকে ডাব পেড়ে আনার জন্য বলে। বাদল গাছ থেকে ডাব পাড়ার জন্য গাছে ওঠে। তার বাবা গাছের পাশেই ছিলেন। হঠাৎ গ্রামের পশ্চিম পাশ থেকে পাকিস্তানি হায়েনারা গ্রামটিতে আক্রমণ করে। দুম দুম শব্দে চারদিক গর্জে উঠতে লাগল। বাদল গাছ থেকে সব লক্ষ্য করতে লাগল। সে প্রত্যক্ষ করল সবই এবং বুঝতে পারল কী ঘটতে যাচ্ছে তার চোখের সামনে। গ্রামের মানুষ যে যেখানে ছিল সবাই নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটতে লাগল। পাকিস্তানি হায়েনাদের এই হঠাৎ আক্রমণে বাদলের বাবা হতবিহ্বল হয়ে পড়ল। বাদল কিন্তু গাছকে নিরাপদ ভেবে গাছে থেকেই সব প্রত্যক্ষ করতে লাগল। গ্রামের মধ্যে বাদলের বাবাকে তারা ধরে ফেললো এবং হত্যা করল।

বাদল গাছ থেকে সব প্রত্যক্ষ করলেও সে কিছুই করতে পারল না। তখন সে নিজের প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত। ফলে নিষ্ঠুরভাবে বাবার হত্যালীলা সবই বাদলকে প্রত্যক্ষ করতে হল নীরবে দুচোখের জলে।

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. রায়হান খান চৌগাছা হাজী সরদার মর্তজ আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৯ম শ্রেণি, রোল : ০৩	**বাদল মিয়া** গ্রাম : সিংহঝুলী বয়স : ৫৬, সম্পর্ক : প্রতিবেশী

মনে হল যমপুর

ধরা পড়ার সময়টা আষাঢ় মাসের প্রথম দিকে; দাদুর বয়স ১৩-১৪ বছর। ম্যারানী ক্যাম্প থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বাগআঁচড়ার একটি গ্রামে চিঠি দেবেন। চিঠিসহ বাগআঁচড়ার নিকট ধরা পড়েন তিনি এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে মেরে আধমরা করা হয়। তার সঙ্গীটিকেও মারা হয়। দাদুরা দুই জন, শুনীল বিশ্বাস ও তিনি বিমল মণ্ডল। তাদের নিয়ে যাওয়া হয় নাভারণ ক্যাম্পে। সেখানে একটি ঘরে আটকে রাখা হয়। সেখানে প্রায় ৪৫ জন লোক ছিল। আমার দাদু সবার ছোট। সাতদিন পালা করে সকলকে মারা হতো। ৪ জনকে গুলি এবং একজনকে বেয়নেটের আঘাতে মারা হয়। এত বেশি মারা হয় যে, কারো মাথার চুল প্রায় ছিল না। সব সময় দু-চারজন অজ্ঞান থাকত। সাতদিন দাদুকে সেখানে রাখার পর নাভারণ ক্যাম্পে নিয়ে জবানবন্দি নেবে বলে হাতকড়া ও মাজায় দড়ি দিয়ে আটজন করে বাঁধল। ক্যাম্পে নিয়ে মারতে মারতে সবাইকে রক্তাক্ত করে জিজ্ঞাসাবাদ করল। প্রতিদিন একখানা রুটি খাওয়া মানুষগুলো অজ্ঞান হয়ে গেল। দাদুর পায়ে পিন ঢুকালো। দাদুর হাতের ছোটো আঙুলের মাথা এবং একটি আঙুল ছিঁড়ে যায়। পাকা রাস্তার ওপর রেখে পায়ের হাঁটুতে রাইফেল দিয়ে তিনটি আঘাত করলে দাদু জ্ঞান হারালেন। জ্ঞান ফিরলে দেখলেন অজানা জায়গা। পরে জানলেন যশোর ক্যান্টনমেন্ট। মনে হল যমপুর। সেখানে মানুষকে মাথা নিচু করে ঝুলিয়ে চাবুক মারছে। পরে দাদুকে যশোর কারাগারে রাখা হয়। দাদুর শরীর থেকে এক পাউন্ড রক্ত নেয়া হয়। সময়টা মনে হয় কার্তিক মাস; দাদু জেল থেকে বেরিয়ে আসেন। দাদুর পা আর ভালো হয়নি। ঠিকমতো হাঁটতে পারেন না।

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
দৃষ্টি বিশ্বাস কুলটিয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় শ্রেণি : ৭ম, রোল নং : ০২	**বিমল মণ্ডল** পাড়িয়ালী, অম্রঝুট, মনিরামপুর, যশোর বয়স : ৬৫ সম্পর্ক : দাদু

কাঠের পা

আমার দাদা বলেছেন, একদিন তিনি অভয়পাশা বাজার থেকে রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরলেন। এসময় আমার দাদা দূর থেকে দেখলেন তার দিকে মিলিটারিরা আসছে। মিলিটারিরা টের পেয়েছে যে, আমার দাদা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। তখন আমার দাদার কাছে অস্ত্রশস্ত্র ছিল না তাই পালিয়ে গেলেন।

আর একটি ঘটনা- আমাদের গ্রাম আড়াগাঁও। সেই গ্রামের এক বৃদ্ধ লোক ছিল। তার পরিবার ছিল খুব গরিব। একদিন রাত্রে সন্তানদের ও তার স্ত্রীকে নিয়ে বিছানায় শুয়েছেন। এসময় মিলিটারি এসে তাদের ঘরে আগুন লাগিয়েছে। এসময় আমার দাদা আমাদের গ্রামের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। তখন দখতে পেলেন এই ঘরের পাশে আগুন জ্বলছে। তখন আমার দাদারা আগুন নিভাল ও তাদের মুক্ত করল।

অনেক দিন আমার দাদা কাটিয়েছেন জঙ্গলে। একদিন আমার দাদা পাঞ্জাবি মিলিটারিদের ভয়ে কোথাও থাকার যায়গা না পেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেন। তখন আমার এক ফুফু, তার জন্ম সংগ্রামের সময়, জঙ্গলে এই কচি শিশুকে নিয়ে ঢোকামাত্রই শিশু কান্না শুরু করল। তখন দাদি তার মুখে কাপড় দিয়ে চেপে ধরে। তবু তার কান্না বন্ধ হয়নি। তাখন পাঞ্জাবি মিলিটারি কান্নার শব্দে খোঁজ পেয়ে গেল। তখন সেই মিলিটারি শিশুটিকে হত্যা করল ও আমাদের গ্রামের অনেক মেয়ে ও মহিলাদের ধরে নিয়ে তাদের ইজ্জত কেড়ে নিল।

আমার দাদা যুদ্ধে গিয়ে মাইনের আঘাতে একটি পা হারান। এই সময় থেকে আমার দাদা নকল পা ব্যবহার করে হাঁটা চলা করেন। সেই নকল পায়ের নাম কাঠের পা।

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
তামান্না আক্তার দুর্গাশ্রম উচ্চ বিদ্যালয় শ্রেণি : ৬ষ্ঠ	**মো. এলাল উদ্দিন** গ্রাম : আড়াগাঁও বয়স : ৮১, সম্পর্ক : দাদা

Speech for Sultana's Dream Reading Campaign Launch

Pairaband, Rangpur
6 July 2023

Linh Anh Morea
UNESCO Regional Office, Bangkok, Thailand

It gives me great pleasure today to contribute this message today in Pairaband, Rangpur, the birthplace of the great feminist writer, thinker and educator Rokeya S. Hossain, to celebrate the inscription of her ground-breaking work of science fiction 'Sultana's Dream' on the Memory of the World Committee for Asia and the Pacific (MOWCAP)'s Regional Register.

From the moment the nomination dossier came to my attention, it was clear that I had been introduced to a collection of works that were truly special. Rokeya S. Hossain's work is a testament to the power of imagination and innovation. In her historically significant works of science fiction, she wrote about helicopters and solar energy long before they were invented, demonstrating the foresight of her imagination, and the power that this holds in pushing innovation forward. The greatest inventions were all once upon a time a product of one's imagination, and today's celebrated author is no exception to this creative process.

As I announced the inscription to the MOWCAP Regional Register on 8 May 2024 in Ulaanbaatar, Mongolia, I was fighting back the tears of emotion and joy, as this successful outcome is the result of two years of frequent consultations to resolve technicalities between individuals and organizations in Bangladesh, Thailand, Cambodia, India, Republic of Korea, China, Kyrgyzstan and all the way to Fiji, to make the dream of this inscription -- which we all shared -- a reality.

In this regard, I would especially like to thank Mr Mofidul Hoque and the Liberation War Museum for their tireless efforts, and for not giving up on their dream. It has been a pleasure collaborating with you and I hope to work closely with more documentary heritage custodians in Bangladesh in the future.

We are also gathered here today to celebrate the launch of a reading campaign organized by the girl students of the region. This initiative is a stellar example of the positive and community-level impact that a Memory of the World inscription can generate. The celebration of this inscription and the reading campaign will undoubtedly contribute to raising awareness of the possibilities that can arise from one's imagination and creativity, possibly from one's very own community, in the same way Rokeya S. Hossain did from her birthplace here in Pairaband.

While we are here to celebrate this significant achievement, we must also remember that there is still work to be done to achieve Gender Equality. The reading of 'Sultana's Dream' should also be encouraged among boys and men so that Rokeya S. Hossain's aspirations for Gender Equality can be achieved together as a community.

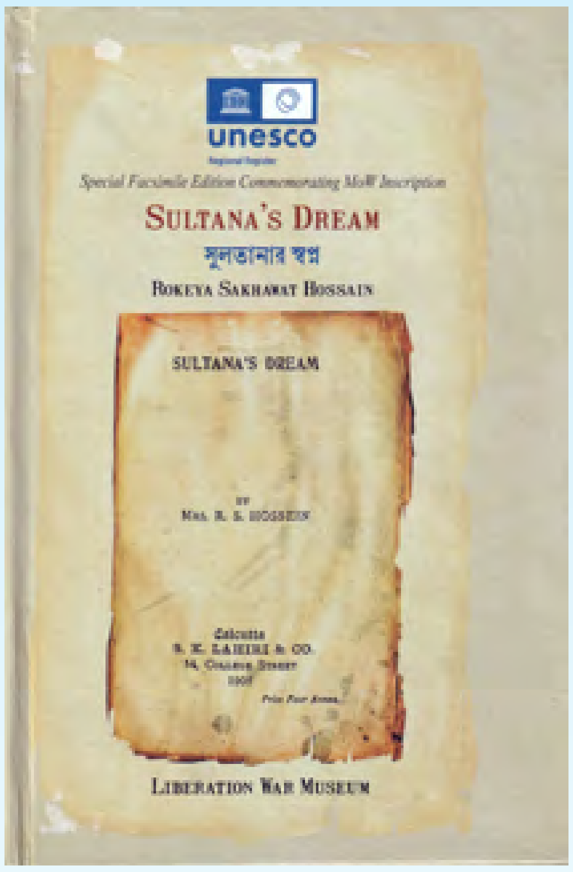

Rokeya S. Hossain's writings have inspired creative works across the world, demonstrating the global impact of her imagination and creativity. To all the women and girls who have a dream, hold on to your dream, as you never know how far it can take you.

To the communities of Bangladesh, congratulations on the recognition of 'Sultana's Dream' by Rokeya S. Hossain as a work of regional significance across Asia and the Pacific, and I wish all the girl students of the region success with this exicting reading campaign.

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনে বিশেষ অতিথি

বাংলাদেশস্থ ডেনমার্কের অ্যাম্বাসেডর গত ২৬ জুলাই সপরিবারে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি মন্তব্য খাতায় লেখন:

A very big thank you for showing us the Liberation War Museum which we have been looking forward to, as so many have recommended the museum to us. Really impressive, educational and a great pleasure.

Once again we are reminded about the struggle of the Bangladeshi people, the rich history and the amazing resilience of the nation. Also a very special time to visit the museum.

Thank you and all the best.

Christian Brix Moller
Ambassador of Denmark and family

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি সৈয়দ রিফাত আহমেদ গত ২৫ জানুয়ারি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি মন্তব্য খাতায় লেখন:

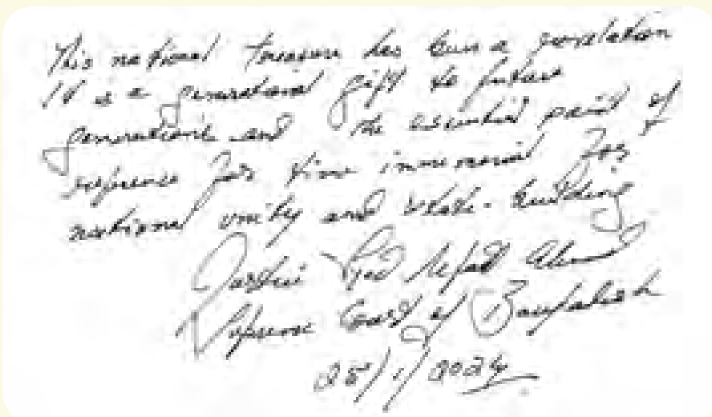

This national treasure has been a revelation. It is a generational gift to future generations and the essential point of reference for time immemorial for national unity and state building.

Justice Syed Refaat Ahmed
Supreme Court of Bangladesh

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মন্তব্য খাতা থেকে

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমি নয় বছরের বালিকা ছিলাম। আমার বাবা এম আব্দুর রহিম (স্বাধীনতা পদক প্রাপ্ত) ৭ নম্বর সেক্টরের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে দেশের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। আমরাও ভারতে আশ্রয় নিয়ে অল্প বয়সে অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করেছিলাম। অনেক স্মৃতি, দুঃখ, ভালোলাগা জড়িত আছে। এই জাদুঘর বাংলাদেশের জন্মের কথা বলে, ইতিহাস বলে, অর্জন বলে। এর প্রচার আর প্রসার আরো বিস্তৃত হোক এই কামনায়।

নাদিরা সুলতানা
০১.০৭.২০২৪

ইংরেজ শাসন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ও পরবর্তী ইতিহাস সুনিপুনভাবে উপস্থিত হয়েছে। গ্যালারি-২ ঘোরার সময় গায়ে কাঁটা দিচ্ছিলো!

প্রত্যয় দিবাকর
০১.০৭.২০২৪

এ নিয়ে দ্বিতীয়বার এই জাদুঘরে আসা কিন্তু মনে হচ্ছে সব কিছুই যেন নতুন করে দেখছি, নতুন করে অনুভব করছি। মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ, তাদের সোনালী জীবনের বিসর্জন আমি কখনোই ভুলব না। চেষ্টা করব যেন দেশের জন্য আমার এই ছোট জীবনে কিছু করে যেতে পারি। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্তৃপক্ষের অতিথি পরায়নতার জন্য ধন্যবাদ।

ফাহাদ বিন সিদ্দিক
০৪.০৭.২০২৪

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আমাদের বাংলাদেশের সম্পদ। প্রত্যেকটা গ্যালারিই তার প্রমাণ। নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে করি বাংলাদেশের জন্মগ্রহণ করেছি বলে। কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ এত সুন্দর করে বাংলাদেশের চিত্র এইভাবে বিশ্বের সামনে তুলে ধরার জন্যে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার আসা, কিন্তু প্রত্যেকবার মনে আরও গভীরভাবে অনুভব করি প্রত্যেক বীরের আত্মতোৎসর্গ। গভীর শ্রদ্ধা জানাই এবং স্মরণ করি। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দেশের জন্য কিছু করে যাব।

মনীষা বিশ্বাস
০৪.০৭.২০২৪

মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যাদের অবদান ছিলো তাদের ভোলার মতো নয়। মহান মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি রইল লাখো শ্রদ্ধা। বাবা এবং ভাতিজাকে নিয়ে এসে খুব ভালো লাগলো, বাবা মুক্তিযোদ্ধাদের গল্প শোনাতেন। আজ আবার বাবা সরাসরি তাদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র দেখালেন, নতুন করে চেনালেন।

মো: মিলন মাহমুদ
আব্দুল্লাহ আল মামুন
নোয়াখালী, সুবর্ণচর
০৬.০৭.২০২৪

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এসে ইতিহাসের কিছু কালো অধ্যায়ের দেখা পেলাম। আমার নানা একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। পরবর্তী প্রজন্মকে ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলতে হবে।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

মো: ইসমাইল হোসেন শুভ
০৭.০৭.২০২৪

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণ উদ্যোগ নিশ্চয় ভালো উদ্যোগ ছিলো। একটি জাতিকে তার জন্মের ইতিহাস প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম জানা অত্যাবশ্যক। উক্ত জাদুঘর প্রদর্শন করিয়া গায়ের লোম যেন ডানা নিয়া উঠিয়াছে। এভাবে একটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রাম যে কারো চোখে ভেসে উঠলে বাস্তবে তার গা শিউরে উঠবে তা নিশ্চিত।
১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ এক কালো অধ্যায়ের অংশিদারী নির্যাতনের শিকার সকলের জন্য দোয়া, সমবেদনা। রাজনৈতিক তৎকালীন সকল নেতা থেকে কর্মী যারা এই মাতৃভূমির মুক্তিতে শ্রম, ঘাম, রক্ত দিয়েছেন সকলের জন্য দোয়া।
বাংলাদেশ শান্তিতে থাকুক। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মো: তানভীর আহমেদ তপু
শিক্ষার্থী, সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা
০৬.০৭.২০২৪

এখানে আসার আগে মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে যা জানতাম তা ছিল শুধু পাঠ্যবইয়ের থেকে পাওয়া তথ্য।
আজ থেকে সকল মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধাটা আরও বেড়ে গেল। তাদের ত্যাগের কারণেই আমরা আজকে স্বাধীন দেশের নাগরিক। আশা করি আমরা তাদের ত্যাগের মূল্য রক্ষা করতে পারবো। বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সুমাইয়া ও সারা
০৬.০৭.২০২৪

মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী সকল শহিদ যোদ্ধা এবং জীবিত যোদ্ধাদের প্রতি ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল। আমাদের জীবনকে স্বাধীনতা ও নিরাপদ করার জন্য তাদের ঋণ কোনদিন শোধযোগ্য নয়। বিশেষ করে বীরাঙ্গনাদের প্রতি অকৃত্তিম ভালোবাসা ও সহমর্মিতা রইল

মো: লুৎফর রহমান
ধনবাড়ি, টাঙ্গাইল
০৯.০৭.২০২৪

মুক্তিযুদ্ধ আমি দেখিনি। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এসে আমি মুক্তিযুদ্ধ অনুধাবন করতে পেরেছি। গর্বে বুক ভরে গেছে। আমি এমন এক জাতির উত্তরসূরী, শ্রদ্ধা রইলো তোমাদের যারা আমাদের কথা ভেবে জীবন উৎসর্গ করেছিলে। সাবাশ, মুক্তিযোদ্ধারা।

বিজয়
প্রভাষক, হিসাব বিজ্ঞান
ডা. রুস্তম আলী ফরাজী কলেজ, মঠবাড়ীয়া, পিরোজপুর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official